ডক্টর ডেথ

অদ্রীশ বর্ধন

ডক্টর ডেথ

অদ্রীশ বর্ধন

"গজমুক্তো দেখেছেন ?"

“যত্তোসব অলীক কল্পনা,” হাসলেন রণ চৌধুরী।

“তবে যে লোকে বলে—” কবিতা নাছোড়বান্দা। গল্প শোনার নম্বর ওয়ান পোকা ও। এতদিন জানতাম, গোয়েন্দা গল্প শুনতেই ভালবাসে। এখন দেখছি শিকারের গল্প পেলেও নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় ।

গল্প জমিয়েছেন বটে রণ চৌধুরী, পুরোনাম রণজিৎ কুমার রায়চৌধুরী। নিজে ছোটখাটো মানুষ- বাপমায়ের দেওয়া পেল্লায় নামটাকেও কেটেছেটে ছোট্ট করে নিয়েছেন। মাথায় তিনি মোটে পাঁচফুট। খসখসে কালো মুখ । মাথার সামনের দিকের সব চুল উঠে গেছে। কানের উপর থেকে লম্বা চুল টেনে আঁচড়ে রেখেছেন পিছনের লম্বা চুলের সঙ্গে। দাড়ি কামান বটে, কিন্তু হিটলারি গোঁফের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি।

বয়স চল্লিশ। নিজেই তা বললেন । না বললে তিরিশের বেশি মনে হয় না । টাইট ফিগার। নিরেট। পেশি বা চর্বি যেখানে যেটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই আছে। বিলক্ষণ চটপটে। নড়াচড়া মসৃণ। টেপা ঠোঁট, চৌকো চোয়াল। আর থ্যাবড়া নাক দেখে প্রথমটা গুরুগম্ভীর মনে হয় বটে, কিন্তু ভুল ভেঙে দেন নিজেই জমাটি আড্ডায় বসলেই।

অথচ ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ জমে উঠেছে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। ভদ্রলোক ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। বাড়িতে বেশি অ্যামপিয়রের মিটারের দরকার হয়েছিল। বিদ্যুতের চাহিদা তো বেড়েই চলেছে। চকিতে রান্নার যন্ত্র, কাপড়কাচার যন্ত্র, ডিশ ধোওয়ার যন্ত্র, টিভি, ভিসিআর, ফ্রিজ— যন্ত্রে যন্ত্রে বাড়ি ভরে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে গজগজ করেছি নিজের মনেই— এ কী যন্ত্রণা শুরু করলে হে প্রিয়তমা !

আমার রূপসী প্রেয়সী শুধু ফিক করে হেসেছে। ওর যুক্তি তো একটাই : ছেলেপুলে থাকলেও তো যন্ত্রণা বাড়ত। যাচ্চলে ! কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা ! পাঁচ অ্যাম্পিয়রে এত কাণ্ড কি চলে ?

শেষকালে কিনা একটা দেড়টন এয়ারকন্ডিশনার এনে বসিয়ে দিল আমার লেখবার ঘরে। এবার শুনলাম নতুন যুক্তি : মাথা ঠাণ্ডা না থাকলে লিখবে কী করে ? আর না লিখলে খাবে কী ?

শোনো কথা! লিখে কারও পেট চলে ? নেহাত বউয়ের বোম্বাইবাসী পিতৃদেবের টাকা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না...।

যাক গে সে কথা। নতুন মিটারের জন্য দরখাস্ত করতে হয়েছিল। শুনেছিলাম, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক সময় নষ্ট করতে হয়...

কিন্তু সেসব কিছু হয়নি। একমাসের মধ্যেই ইন্সপেকশন হয়ে গেল, মিটার বসে গেল, তারপরেই এল একটা টেলিফোন—

"মৃগাঙ্ক রায় বলছেন ?"

"বলছি।"

"আপনার নামছাপা বাংলা লেটারহেড আমার সামনেই রয়েছে। ভাগ্যিস বাংলায় দরখাস্ত করেছিলেন।"

"দরখাস্ত ! আমি করেছি ?"

"সি ই এস সি-তে দরখাস্ত করেননি ?"

"হাঁ, হা—"

"মিটার তো পেয়ে গেলেন, তাই"

"আপনি ?"

"সি ই এস সি থেকেই বলছি। আপনার লেখা অ্যাদ্দিন পড়েছি কিন্তু হাতের লেখা কোনওদিন দেখিনি। আপনাকে দেখতেও ইচ্ছে করছে। মিটারটা না দেওয়া পর্যন্ত সাহস পাচ্ছিলাম না।"

"কী যে বলেন । চলে আসুন। আপনার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করাই হয়নি।"

"রণ চৌধুরী।"

অফিস থেকে সোজা চলে এসেছিলেন রণ চৌধুরী। এক ঘণ্টাও হয়নি এখনও— আসর জমিয়ে দিয়েছেন। শিষ্টাচার বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেপে কথা বলেছিলেন, ওজন করে হেসেছিলেন। তারপর কবিতা এসে বসল আমার পাশে। সন্দেশ-টন্দেশ বাড়িয়ে দিয়ে এক্কেবারে ঘরোয়া স্টাইলে বলে বসল—

"এত গোয়েন্দা গল্প পড়েন কেন ?"

মুচকি হেসে রণ চৌধুরী বলেছিলেন—

"অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি বলে।"

"শুধু পাতায় পাতায় ?" অতিথির পেটাই কালো চেহারাটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিরীহ গলায় বলেছিল কবিতা। আঁচ করেছিল ঠিকই। রণ চৌধুরীর খসখসে কালো রঙ আর শক্ত চওড়া চোয়ালের কোথায় যেন একটা বুনো ব্যাপার লুকিয়েছিল। বেজায় বেপরোয়া, ভয়ানক দুর্ধর্ষ লোকদের চোয়ালের কোণ এইভাবে তেউড়ে থাকে, চোখের মধ্যে এইরকম কৃপাণ-চাহনি দেখা যায়।

কবিতার এক খোঁচাতেই তাই কাজ হয়েছিল।

ভারিক্কি মুখোশটাকে টান মেরে ফেলে। দিয়েছিলেন রণ চৌধুরী। এতক্ষণ টিপে হাসছিলেন, এবার দাঁত দেখিয়ে হাসলেন । চোখে দেখালেন রোশনাই- যেন মনের জানলা খুলে গেল। বললেন— "পাতায় পাতায় বিচরণ করি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্যে। ফাঁক পেলেই বেরিয়ে পড়ি অ্যাডভেঞ্চারে।"

"দেশভ্রমণ ?"

"শুধু বনে জঙ্গলে।"

এবার সিধে হয়ে বসল কবিতা। আমিও। রণ চৌধুরী প্রসন্ন চাহনি মেলে ধরে বলে গেলেন-

"শিকার করি। বুনো জন্তু।"

সেই যে শুরু হল শিকারের গল্প— গড়িয়ে এল একটি ঘণ্টা— ইচ্ছে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি ভাবেই শুনে যাই ওঁর গল্প। এইমাত্র শেষ করলেন শঙ্খচূড়ের ছোবল খেয়েও বেঁচে যাওয়ার আশ্চর্য কাহিনী। পনেরো ফুট লম্বা মাপ— ফণা তুলে ধরেছিল পাঁচ ফুট উপরে— একটা হরিণের দিকে। প্রথমে উনি দেখতে পাননি— ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে

এসেছিলেন হরিণ বধ করবেন বলে। কিন্তু হরিণ কেন তাঁর দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না। কেন অন্যদিকে চেয়েই রয়েছে- দেখতে গিয়ে দেখলেন ভয়ঙ্কর সরীসৃপকে। বিশাল ফণা লক্ষ করে বন্দুক চালালেন বটে— কিন্তু তার আগেই শঙ্খচূড়ের ছোবল নেমে এল তাঁর দিকে— শিকারি বুটের শুকতলা ভেদ করে বিষদাঁত ঢুকে গেল ভিতরে—

রাখে হরি মারে কে! বুড়ো আঙুলের ঠিক পা। দিয়ে গেছিল বিষদাঁত। ছোবল মারার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেছিল বলে ফাঁপা বিষনল থেকে বিষ বেরিয়ে গেছিল বাইরে। ছুরি দিয়ে ফণা কেটে ফেলেছিলেন রণ চৌধুরী। স্ট্রেচারে শুয়ে হাসপাতালে, পৌঁছেছিলেন। ডাক্তার এসে বুট খুলেছিলেন— হতভম্ব হয়ে গেছিলেন করাল বিষদাঁতের নিস্ফল প্রয়াস দেখে ।

এই পর্যন্ত শুনেছিলাম দম বন্ধ করে। হাতে চিবুক রেখে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল কবিতা, শঙ্খচূড়ের কাহিনী শেষ হতেই মস্ত নিশ্বাস ফেলে বলেন – "এরপরেও শিকারের সাধ আছে ?"

রণ চৌধুরী এবার বুক পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করলেন। চেককাটা ডবল বুকপকেট শার্টের জন্যে ওঁকে এত অল্পবয়সী মনে হচ্ছিল। একটা বুকপকেটে ঠাসা ছিল চামড়ার লম্বাটে বাক্স। ভিতরে চারটে লম্বা চুরুট ।ঢাকনি খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন । বললেন— "আপনার জিনিয়াস ফ্রেন্ড যখন এ জিনিস ভালবাসেন— আপনিও নিশ্চয় ?" টেনে নিলাম একবেগদা লম্বা একটা চুরুট। গ্যাসলাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন রণ চৌধুরী। ধরালেন নিজেরটাও।

ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন। পরিতৃপ্ত গলায়— "ম্যাডাম, শিকার করা বড় পাজি নেশা। যেমন আপনার প্রতিভাবান ঠাকুরপো– গ্রেট ইন্দ্রনাথ রুদ্র– উনি কি ছেড়ে দিতে পারবেন অপরাধী শিকার করা ?"

"মরে গেলেও পারবে না," বললে কবিতা।

"আমিও শিকার করা ছাড়িনি— ছাড়বও না। এই তো হাতির জঙ্গল ঘুরে এলাম। গভর্নমেন্ট থেকে পাঠিয়েছিল । ইলেকট্রিক কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও গুণ্ডা হাতি রোখা যাচ্ছে না।"

"মেরে এসেছেন ?"

"নিশ্চয়। হাতিদের রোম্যান্সও দেখেছি।"

"হাতিদের প্রেম ?"

“এবং ফুলশয্যার রাত— সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বলছি, বলছি—”
ঠিক এই সময়ে বাচ্চা মেয়ের মতো জিজ্ঞেস করেছিল কবিতা— “গজমুক্তো দেখেছেন ?”
রণ চৌধুরী বলেছিলেন—“যত্তো সব অলীক কল্পনা।” বলে, একটু হেসেছিলেন। তারপর আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন,
–“গজমুক্তোর চেয়েও অদ্ভুত একটা ব্যাপার এবার দেখে এলাম। মৃগাঙ্কবাবু, ব্যাপারটায় রহস্য আছে। আপনার গল্পের খোরাক হতে পারে। আপনার জিনিয়াস ফ্রেন্ড তো শুনলেই নেচে উঠবেন।”
কাজের মানুষ রণ চৌধুরী তাহলে অকারণে। আসেনি-রহস্য তাঁর মাথায় কামড়াচ্ছে বলেই দৌড়ে এসেছেন।
বললাম- “ব্যাপারটা কী ?”
“শঙ্খচূড়ের ছোবল খাওয়ার আগে ঝোপের মধ্যে দিয়ে গুড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম বলেছি ?”
“পিছনে ছিল আপনার গাইড ।”
“লোকাল গাইড। যে ঝোপটার মধ্যে দিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে গেছিলাম, সে জায়গাটায় সাদা উইপোকার আড়া— ভীষণ স্যাঁৎসেঁতে, অস্বাভাবিক নির্জন, পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। জঙ্গলে বিকেল হলেই অন্ধকার ঘনায়। চারদিকে পলাশ, বড় বড় এলিফান্ট ঘাস জাতীয় ঘাস আর শালগাছের স্যাপলিং। দোনলা বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম ঝোপের বাইরে, উঁকি দিয়েই দেখলাম চিতল হরিণের বাচ্চাটাকে । এত সেন্সিটিভ জন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়েও পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল দেখেই ধোঁকা লেগেছিল। তারপরেই দেখলাম শঙ্খচূড়ের কুলোর মতো ফণা ইন্ডিয়ার বিভীষিকা— তারপর কী হয়েছে, আগেই বলেছি। হাসপাতালের, এমারজেন্সিতে যখন ঘোরের মধ্যে শুয়েছিলাম— মরে আছি কি বেঁচে আছি। বুঝতেই পারছি না— তখন নজর যায়নি নিজের জামাপ্যান্টের দিকে। অপারেশন থিয়েটার থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক লাগল । আমার মুখ, হান্টিং ক্যাপ, শার্ট, প্যান্ট— সব জায়গাই হড় হড় করছে। চটচটে আর তেলতেলে গ্রিজ লেগেছে যেন। অথচ যখন ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিলাম— ছিলাম ফিটফাট । শঙ্খচূড়ের ছোবল তো হান্টিং বুট ফুঁড়ে গেছে— গোটা গায়ের অবস্থা এরকম হল কেন ? আঙুল দিয়ে একটু গ্রিজ তুলে, নাকের কাছে নিয়ে এলাম— দুর্গন্ধ।”

"বিষ ছিটিয়ে লাগেনি তো ?"

"আরে না...ভয়ানক সেই নিউরোটক্সিক পয়জন মুখের চামড়ায় লাগলে কী হত ভগবান জানেন। তাছাড়া, বিষদাঁত কি পিচকিরি যে বিষ ছেটাবে ?" কবিতা বললে— "জায়গাটায় উইপোকার আড্ডা ছিল বলছিলেন— খুব স্যাঁৎসেঁতে— ওদের গায়ের গ্রিজ নয়তো ?"

হাসলেন রণ চৌধুরী। এতক্ষণে খেয়াল হল ভদ্রলোককে কেন অত বুনো মনে হচ্ছিল। বুলডগের মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের বেশ মিল আছে হিটলারি গোঁফটা বাদে। ভীষণ জেদের প্রতীক ওই গোঁফ— সেইসঙ্গে ওই মুখ ।

হেসে বললেন— "উই কখনও গ্রিজ ছড়ায় ?"

"তাহলে আপনার কী মনে হয় ?" বললে কবিতা ।

"ম্যাডাম, সেটাই বুঝতে পারিনি। বহুবছর জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। অনেক পোকামাকড়ের কামড় খেয়েছি— কিন্তু সারা গা এরকম চটচটে দুর্গন্ধে ভরে যায়নি। তাই একটু সামলে নিয়েই ফের গেলাম সেই ঝোপে।"

আঁতকে উঠল কবিতা— "মরা শঙ্খচুড় দেখলেন ?"

"সে কি আর থাকে। নেকড়ে টেনে নিয়ে গেছে নির্ঘাত। এবার গেছিলাম বেলাবেলি ঢুকেছিলাম ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে। দিনের আলোয় দেখলাম গ্রিজ। কীভাবে গায়ে লাগছে, তাও দেখলাম।"

চেয়ে রইল কবিতা। আমি চুরুটে টান মারতেও ভুলে গেলাম।

"গাছের পাতা থেকে," বললেন রণ চৌধুরী।

"গাছের পাতায় গ্রিজ !" চিবুক থেকে হাত নামিয়ে নিল কবিতা। "তাও কি হয় ! কীরকম গাছ ?"

"এলিফান্ট ঘাস জাতীয় ঘাস, শালগাছের স্যাপলিং লেপটানো ঝোপ- যাদের ধর্ম তেল বা গ্রিজ উৎপাদন করা নয়।"

"বিশেষ জাত নয় তো ?"

"না। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সব ঝোপের উপর দিকে বেশি করে চটচটে হয়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে ভুষো-ও জমেছে। মাটিতেও তাই বড় গাছের পাতাতেও তাই। তাহলেই বুঝছেন— গাছের পাতা এই গ্রিজ বানায়নি"

"উড়ে এসে পড়েছে ?"
"ঠিক তাই। তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। পৃথিবীতে এরকম আশ্চর্য ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। হাজার হাজার ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছে, জ্যান্ত সাপ আকাশ থেকে নেমে এসেছে, সমুদ্রের শামুক ডাঙায় এসেছে মেঘলোক থেকে। পৃথিবীটা বড় আশ্চর্যের জায়গা, ম্যাডাম— গ্রিজ নিয়ে তাই আর মাথা ঘামাইনি। তবে খটকা লাগল ওইরকম এক নিরিবিলি জায়গায় আমার পিছনে লোক লাগায়।"

চুরুট নিভে গেছিল। ধরিয়ে নিলেন রণ চৌধুরী। আমরা দুজনে একদৃষ্টে চেয়ে আছি ওঁর দিকে। এখন উনি আর হাসছেন না। বললেন– "দিনের আলো যখন ফুরিয়ে আসছে, তখন ফিরে চললাম জিপের দিকে । প্রায় তিন কিলোমিটার জঙ্গল ভেঙে গেলে তবে রাস্তা পাব। রাইফেল বাগিয়েই চলেছি। চারদিকের গভীর জঙ্গলে চোখ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। এমন সময়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনলাম।

"প্রথমে ভেবেছিলাম বনের জন্তু। আওয়াজটা এসেছিল আমি যেদিকে যাচ্ছি সেইদিক থেকে। বনে জঙ্গলে ঘুরে কান আর হাত এমন তৈরি হয়ে গেছে যে, শব্দ লক্ষ করে বন্দুক চালিয়ে দিতে পারি। সেফটি ক্যাচ অন করতেই খড়মড় আওয়াজটা খুব জোরে মিলিয়ে গেল সামনের দিকে।

"স্পষ্ট মনে হল, কে যেন ছুটে পালিয়ে গেল । বনের জন্তু তাহলে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল ? সেফটি ক্যাচ অন করতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে গেল ? এত বুদ্ধি থাকে বনের জন্তুর ? পালাবার হলে আগেই পালাত,চোখে চোখে রেখে আড়ালে আড়ালে যাবে কেন ?

"ম্যাডাম, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জিনিসটা আমার মতো জংলিদের মধ্যে বেশি করে থাকে। আবার মনে হল— যে পালালে, সে জানোয়ার নয়— মানুষ। তাই আমি ছুটলাম শব্দ লক্ষ করে । সামনের আওয়াজ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু সে ছুটছে ঠিক হরিণের মতো দেখতে দেখতে আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।"

কবিতা বললে— "তাহলে হরিণই দেখছিল। আপনাকে সেই চিতল হরিণের বাচ্চাটা— যাকে মারতে গিয়ে শঙ্খচূড়ের ছোবল খেয়েছিলেন।"

বুলডগ মুখে সাদা দাঁত দেখিয়ে এতক্ষণে এক চিলতে হাসি হাসলেন রণ চৌধুরী। বললেন–

“তাহলে গাড়িটা চালাল কে ?”

“গাড়ি ! কার গাড়ি ? আপনার ?”

“না। ইঞ্জিনের আওয়াজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক কিলোমিটার দূরেও কানে পৌঁছেছিল । প্রথমে ভেবেছিলাম আমারই জিপ নিয়ে বুঝি লম্বা দিল কেউ। তারপরেই বুঝলাম— জিপের আওয়াজ নয়— অন্য গাড়ির। পাঁই পাঁই করে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম জঙ্গল থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার জিপ। কাঁচা রাস্তায় তখনও ধুলো উড়ছে— একটু আগেই যেন একটা গাড়ি চলে গেছে সদর শহরের দিকে।

“ভাগ্যিস জিপ নিয়ে পালায়নি। সদর শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। জিপটাও আমার নয়— ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসের।

“ফিরে গিয়ে তাই জিপ আগে ফেরত দিলাম । ডি. এফ, ও. কে জিজ্ঞেস করলাম ঠাট্টার সুরে-- ‘কাকে পাঠিয়েছিলেন আমার পিছনেই ?'

“ভদ্রলোক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন— 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

“সব বললাম। উনি বললেন—'এই ব্যাপার ! পোচার-টোচার হবে। আপনার জন্য তার আর শিকার করা হল না। জঙ্গলের পাস তো আজ কাউকে দিইনি।'

“ব্যাপারটা ওইখানেই মিটে গেলে ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু রাতে ফরেস্ট বাংলোয় শুয়ে কিছুতেই ঘুমতে পারলাম না। মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিচ্ছিল পুরো ব্যাপারটা। লোকটা আমাকে ফলো করেই এসেছিল। আমার জিপের সামনেই তার গাড়ি রেখেছিল— তেল পড়ে থাকতে দেখেছি কাঁচা রাস্তায়। কেন ? পোচার-ই যদি হবে— গাড়ি লুকিয়ে রাখবে। তো অন্য জায়গায়। আমার গাড়ির সামনে রাখতে যাবে কেন ? ছুটে পালিয়ে গেল কেন ? আমাকে নজরে রাখাটাই তাহলে আসল উদ্দেশ্য। আমি কী করতে গেছি জঙ্গলে সেটাই দেখতে গেছিল।

“সেই যে মাথার পোকা নড়ে উঠল বাকি রাতটা প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ছুটলাম ডি. এফ, ওর অফিসে।

বললাম- 'জিপটা আবার ধার দিন ।'

উনি বললেন— ‘আবার কী হল ?'

আমি বললাম— 'গ্রিজ লাগানো পাতা আনতে যাব।'

উনি আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। জঙ্গলের পাতায় গ্রিজ লেগে থাকার ব্যাপারটা ওঁকে আগেই বলেছিলাম। বললেন—'আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে ? যাকগে যান— ড্রাইভার নিয়ে যান। গাইড সঙ্গে থাকুক।'

আমি বললাম, 'কাউকে দরকার নেই। একাই যাব।'

ডি. এফ. ও বললেন— 'মিঃ চৌধুরী, পোচাররা বড় ডেঞ্জারাস হয়।'

'হোক।'

চলে গেলাম একাই। কান খাড়া করে রইলাম। পিছনে গাড়ি এলে যাতে ধরতে পারি, তাই জঙ্গলের ভিতরে একটু ঢুকেই গুঁড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে রইলাম। |

কোনও গাড়িকেই আসতে দেখলাম না। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলাম তিন কিলোমিটার পথ মাড়িয়ে শঙ্খচূড়ের খতম-স্থলে। চারদিকে বড় বড় ঘাস। কেউ লুকিয়ে থাকলে তারমাথা দেখা যায় না। "এমন সময়ে শুনলাম খুব অস্পষ্ট একটা শব্দ।

"হাতি ইনফ্রাসোনিক সাউন্ড শুনতে পায়— জানেন নিশ্চয়। দশ বিশ মাইল দূরের দলবলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। অতবড় কান বলেই বোধহয় পারে। আমি কিন্তু এই ছোট কান দিয়েই জঙ্গলের পাতার শব্দের নানারকম মানে বের করতে পারি। সেই মুহূর্তে যে শব্দটা শুনলাম, তা সন্দেহজনক । তাই টুপ করে শুয়ে পড়লাম মাটির উপর।

"সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল বন্দুক। শন শন করে গুলি চলে গেল মাথার উপরকার ঘাসের মধ্যে দিয়ে। আর একটু দেরি হলেই খুন হয়ে যেতাম।

"শুয়ে শুয়ে শুটিং পজিশন নিলাম— গুলি চালালাম শব্দ লক্ষ করে একবার নয়— বারবার। ছুটে যে পালিয়ে গেল— তার গায়ে লাগাতে পারলাম না।

"ছুটেছিলাম আমিও। কিন্তু নাগাল ধরতে পারলাম না। জঙ্গল থেকে বেরনোর আগে এবারও শুনলাম গাড়ির আওয়াজ।। ফুলস্পিডে চলে গেল শহরের দিকে।

"বুঝলাম। আমার আগেই সে এসেছিল। লুকিয়ে রেখেছিল গাড়ি। আগেভাগেই এসে ওৎ পেতেছিল শঙ্খচূড়ের জায়গায়।

"কিন্তু সে জানল কী করে যে, আমি জঙ্গলে যাচ্ছি ?..."

"ডি. এফ. ও বলেছেন ?" আস্তে বললাম আমি।

চুরুট নামিয়ে চেয়ে রইলেন রণ চৌধুরী।

“গ্রেট ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সঙ্গে কনসাল্ট করা যাবে। কি ?”
প্রস্তাবটা আমার মাথার মধ্যেও ঘুরপাক খাচ্ছিল কিছুক্ষণ ধরে। কবিতাও নিশ্চয় ভাবছিল একই লাইনে। রণ চৌধুরী আলগোছে দীর্ঘ কাহিনীর শেষে শেষ মোচড়টি মারতেই আমি হাত বাড়িয়েছিলাম যন্ত্রণার যন্ত্রটার দিকে। রিসিভার আমার হাত থেকে কেড়ে নিল কবিতা। বললে— “তোমার কম্মো নয় ওই হদ্দকুঁড়েকে ডেকে আনা। দ্যাখো গিয়ে এখন হয়তো ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে বই পড়ছে।”
এই বলে ফটাফট বোতাম টিপে লাইন জুড়ে নিল ইন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাড়িতে। বললে শক্ত গলায়— “মহারাজের এখন কী করা হচ্ছে ? বই পড়া হচ্ছে ? ..এদিকে যে এক কাঁড়ি বেঁধে বসে রইলাম, গিলবে কে ? ...কী বেঁধেছি ? আমানি খিচুড়ি আর পমফ্রেট মাছ ভাজা ? ফ্রিজে রেখে দাও... এখানে রয়েছে ইংলিশ আর চাইনিজ রান্না, ইটালিয়ান আর জার্মান রান্না, ডাচ আর পার্শি রান্না, বর্মি আর সিন্ধি রান্না... হা, হা হজমের ওষুধ আছে... সাংঘাতিক রহস্য-বটিকা... বুঝেছ ? তাহলে আর ল্যাজ নেড়ো না... একা আসবে... গার্ল ফ্রেন্ড-টার্ল ফ্রেন্ড থাকলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দাও... কেউ নেই ? গুল মারবার জায়গা পাওনি ? ক্যারেকটারলেস ব্যাচেলর কোথাকার।”
রিসিভার নামিয়ে রাখল কবিতা। এখন আর মুখ শক্ত নয়। মজা নাচছে দুই চোখে। রণ চৌধুরী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসি গোপন করতে করতে বললে—“ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি না করলে আবার পেটের ভাত হজম হয় না। ওর মনটা বড় সুন্দর— সুন্দর চেহারার মতোই।”
ঢোক গিলে বললেন রণ চৌধুরী। – “কিন্তু ম্যাডাম, আমিও যে ব্যাচেলর ?”
এইবার আমার ছাদ কাঁপানো অট্টহাসিটা না হেসে আর পারলাম না। বিরাগপূর্ণ চোখে। চেয়ে কবিতা বললে— “মরণ ।”

কিমা আলু আর টিকিয়া কাবাবের দিকে তাকিয়ে বিরসবদনে বললে ইন্দ্রনাথ— “শুধু এই ?”
কবিতা বললে- “এটা দিয়ে স্টার্ট করো পেটুক দামোদর, তারপর হবে খানা আর পিনা।”
চোখ সরু করে ইন্দ্রনাথ বললে— “পিনা ! রিয়্যালি ?”

"ছোট্ট একটু ব্র্যান্ডি। —মিঃ চৌধুরী, আপত্তি নেই তো ?"

"কী যে বলেন ম্যাডাম—জংলি মানুষ, হাড়িয়া পর্যন্ত চালাই।"

"এখানে পাবেন স্রেফ টিসি— কর্তার ইচ্ছায় কর্ম," বলে আমার দিকে ঝলক দৃষ্টি হেনে টি সি ব্র্যান্ডি আনতে উঠে গেল কবিতা।

অমনি বললে ইন্দ্রনাথ- "আপনার প্রব্লেমটা এবার বলুন।"

রণ চৌধুরী বললেন। যখন শেষ করলেন, তখন টিকিয়া শেষ, টি সি আসছে।

ইন্দ্র বললে— "গাছের পাতা এনেছেন ?"

নিরুত্তরে ব্রিফকেস খুললেন রণ চৌধুরী।

বেরলো আর একটা চামড়ার সিগার কেস।

ঢাকনি খুলে বাড়িয়ে ধরলেন ইন্দ্রনাথের সামনে।

ভিতরে ঠাসা রয়েছে পাতা আর ঘাস। শুকিয়ে এলেও গায়ে যেন কালচে কাদা লেগে রয়েছে। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুকে ইন্দ্র বললে "বল হরি হরিবোল। —মিঃ চৌধুরী, গাছের পাতার গন্ধ আর গ্রিজ, চোরাগোপ্তা বুলেট আর
পোচারের রহস্যভেদ করার জন্য পুলিশ ডিটেকটিভের স্মরণ নিলেন না কেন ?"

"ইন্দ্রবাবু,গত দু'বছরে কলকাতায় কোনও বিস্ফোরক দ্রব্য পরীক্ষা করা যায়নি কেন ? কেন আজও জাল ক্যাসেট পরীক্ষা করার গবেষণাগার বসেনি। পুলিশ ডিটেকটিভদের দরকার আরও পেশাগত প্রশিক্ষণ, দরকার ফোরেনসিক সায়েন্সের জ্ঞান"

"পুলিশে ছুঁলে আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ ঘা হয় মশায়। অত প্লেন স্পিকিং আর করবেন না। গাছের পাতা কেন এনেছেন, তা বোঝা গেল। থাক আমার কাছে। এখন জানতে চান কোন রাস্কেল খতম করতে চেয়েছিল আপনাকে ?"

"এবং কেন ?"

"তাহলে তো যেতে হয় অকুস্থলে ।"

টিসি নিয়ে ঘরে ঢুকল কবিতা— "আমিও যাব । হাতির রোম্যান্স দেখব।"

জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিহার বর্ডারের গা ঘেঁষে। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। শেষ নেই, শেষ নেই। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। গঙ্গার পাড়ের মানুষ

আমি,এত পাহাড় একসঙ্গে দেখলে মন মোহিত তো হবেই। আমরা উঠেছি রেঞ্জ অফিসারের গেস্ট হাউসে— টানা লম্বা একটা পর্বতশ্রেণীর ঠিক নীচে। উটের কুঁজের মতো সারি সারি পাহাড় চলে গেছে বিহারের মধ্যে— সাঁওতাল পরগণা ছেয়ে রয়েছে পুরো পাহাড়ি অঞ্চলে। ব্রিটিশদের তৈরি এই গেস্ট হাউসের ঘরগুলোর সিলিং উচু, লম্বায় চওড়ায় বেশ বড়। পরপর তিনখানা ঘর, সামনে চওড়া বারান্দা— এত চওড়া যে কলকাতায় তাকে রাজপথ বলা হয়। বারান্দার সামনে বিরাট বাগান। ওই বাগানের পর পাঁচ কিলোমিটার জঙ্গল ঠেঙিয়ে গেলে বিহারের বর্ডার। রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ ঘটক সস্ত্রীক থাকেন । পাশের কোয়ার্টারে ফুটফুটে মেয়েটির বয়স মোটে তিন। সে এখন কবিতার ন্যাওটা হয়ে গেছে। বেচারা ! পাণ্ডববর্জিত এই অঞ্চলে কেউ তো আসে না। সঙ্গী পায় না। সদর শহর এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। ইন্দ্রনাথ সেখানে থাকতে চায়নি। গোঁয়ার গোবিন্দ রণ চৌধুরীও চান না। অতদূর থেকে জিপ নিয়ে যাতায়াতে বিলক্ষণ অসুবিধে। তবে একটা দিন ওখানেই ছিলাম। বাজারে ভাল মাছ এলে গন্ধে গন্ধে যেমন খদ্দের চলে আসে, ইন্দ্রনাথ আসছে খবর পেয়েই শহরের গণ্যমান্য কিছু মানুষ আমাদের আটকে দিয়েছিলেন। আড্ডাটা বসেছিল ডি. এফ. ও প্রদীপ কাঞ্জিলালের কোয়াটারেই। তাঁকে দেখলে কাজিরঙ্গার এক-শিংওলা গণ্ডারের কথা মনে পড়ে যায়। এ রকম ঢিবি কপাল আর বিরাট নিরেট বপু চট করে চোখে পড়ে না। ভগবান শুধু একটা প্রাণীকেই হাসতে শিখিয়েছেন সে প্রাণীটার নাম, মানুষ। শেখাননি শুধু প্রদীপ কাঞ্জিলালকে। অথচ তাঁর আপ্যায়নে ত্রুটি নেই। যাকে বলে জামাই-আদর— ওই একটা দিন আর একটা রাতে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যায় বসিয়েছেন আড্ডা। সেখানে এসেছিলেন শহরের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার— অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য। এঁরা নাকি কেউ কাউকে দেখতে পারেন না, দুজনেই একই সঙ্গে রুগিও দেখেন আবার জঙ্গল থেকে হার্বস এনে তা থেকে ওষুধ বানিয়ে বিক্রিও করেন। দু'জনের দু'রকম চেহারা। অচেতন বাট মোটেই বিরাট পুরুষ নন বরং খ্যাংরাকাঠির মাসতুতো ভাই বলা যায় তাঁকে। যেমন লম্বা, তেমনই রোগা। তবে খুব ফর্সা। চোখে মুখে একটা বনেদিয়ানার ছাপ আছে। বয়স চল্লিশের কোঠায় বলেই মনে হয়েছিল প্রথমে তারপর, শুনলাম, তাঁর মুখেই শুনলাম, পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন এই সেদিন। চোখে সোনালি চশমা। নাকটা একটু ভোঁতা। চোখ সামান্য কুটিল। দেখলে খুব সরল লোক বলে মনে হয় না। কথা বলেন

মুরগির লড়াইয়ে মুরগির মতো বুক চিতিয়ে ।
বিশেষ করে এটা দেখা যায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে। মনোহর আচার্য লোকটা দারুণ বেঁটে, তবে গাঁট্টাগোট্টা, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ এবং তাঁকে গুলবাঘের ভায়রাভাই বলা যায়। কিন্তু অতিশয় অমায়িক, কথায় ঝরছে মধু, চোখে বর্ষণ করছে অভয়। তাঁর এই অভয় চাহনি দেখেই নাকি পনেরো আনা রুগির রোগ সেরে যায়। বয়সে অচেতন বরাটের চেয়ে দশ বছরের ছোট, এই শহরের বনেদি ডাক্তারও তিনি নন— এসেছেন বছর দশেক আগে কিন্তু পসার জমিয়েছেন বেশি।
অচেতন বরাট তো বলেই ফেললেন আমাদের সামনে“এই যে উড়ে এসে জুড়ে বসা খই ! আছেন কেমন ?”
মনোহর আচার্য তাঁর আবলুসকান্তি উজ্জ্বলতর করে মধুর হেসে বললেন- “আপনার দয়ায় দু পয়সা করে তো খাচ্ছি। রুগিদের আপনি ছেড়ে না দিলে আমার চেম্বার ফাঁকা যেত।”
কটমট করে চেয়ে রইলেন অচেতন বরাট।
স্পষ্ট বুঝলাম, জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন কিন্তু মনোহর আচার্যেরই বোন- সন্ধ্যা। সন্ধ্যা একটা রিয়াল বিউটি। তিলোত্তমা-ফিলোত্তমার বর্ণনা গল্পে পড়েছি। বিউটি কনটেস্টে নামলে সবাইকে টেক্কা মেরে যেতে পারে এই মেয়েটা।
মনোহরের বিপরীত আকৃতি তার। ভাইয়ের চেয়ে ফর্সা, ভাইয়ের চেয়ে লম্বা। চোখ যখন ঠাণ্ডা— তখন পূর্ণিমা চলছে ; আর যখন গরম— তখন যেন সাহারার সূর্য। গায়ে স্রেফ একটা সাদা টি-শার্ট আর ব্লু জিনস আর কিছু নেই। এই সন্ধ্যাই এগিয়ে এসে মুরগি লড়াই থেকে বঞ্চিত করেছিল আমাদের। ধমকে উঠল অচেতন বরাটকেই—“কেন পিছনে লাগতে আসেন ?”
ধমক খেয়ে যেন নেতিয়ে পড়লেন অচেতন বরাট।
পুলিশকর্তাও এসেছিলেন আসরে। নতুন আই, পি, এস। সদাহামবড়া ভাব। ফিটফাট ফুলবাবু। ইনি আবার অষ্টপ্রহর পাইপ কামড়ান আর চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন। সন্ধ্যার প্রতি ছুক ছুক মনোভাব দেখেই বুঝে নিলাম তাঁর ওভারস্মার্ট হওয়ার কারণ। এঁর নাম সঞ্জয় ভঞ্জ। পড়াশুনো যে বিলক্ষণ, তা কথায়। কথায় জানাতে চান। হাক্সলি বলেছিলেন, প্রাচীন সভ্যতার মানুষগুলো ছিলেন Wise fool, আর আধুনিক যুগের মানুষগুলো।

Intelligent fool, সঞ্জয় ভঞ্জকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছে।
আসরে সবচেয়ে নিপাট নিরীহ মানুষ বলতে হাজির ছিলেন ওসমান সাহেব। সাতপুরুষের ব্যবসাদার। পূর্বপুরুষরা ঘোড়ায় করে জঙ্গল আর পাহাড় থেকে লাক্ষা এনে বেচতেন। শহরে। এখান থেকে চাল,ডাল,তেল,নুন নিয়ে গিয়ে বেচতেন জঙ্গল আর পাহাড়ে। এখন তা নেই— কিন্তু বড় বড় দোকানের মালিক হয়ে বসে আছেন ওসমান সাহেব। দুনিয়ার সব জিনিসই পাওয়া যায় শহরময় ছড়ানো তাঁরই দোকানে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের রোগে ভুগছেন বলেই জলহস্তীর আকার ধারণ করেছেন, চলতে-ফিরতে হাঁপান, কথা বলতেও কষ্ট হয়। আয়ু যে সীমিত, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর স্তিমিত চক্ষুপ্রভা দেখে। ঘণ্টা বেজেছে, উনি তা শুনেছেন। এঁর মখেই শুনলাম এই শহরের একটা অস্বস্তিকর ঘটনাপরম্পরার কাহিনী।
ঘোড়া দেখলেই যেমন ঘোড়ায় চড়ার শখ হয়, সিনেমার লোককে দেখলেই যেমন'সিনেমার কথা জানতে ইচ্ছে যায়, ঠিক তেমনই একটা জীবন্ত গোয়েন্দা (গল্পের গোয়েন্দা নয়) দেখলেই খুব সামান্য সামান্য ব্যাপারগুলোকেই অসামান্য রহস্যময় মনে হয়। আর সবিস্তারে তা গোয়েন্দার কানে তুলতে সাধ জাগে। এই সাধ জেগেছিল সবারই প্রাণে। আসরের আয়োজনটাই হয়েছে সেই কারণে। ছিপিটা খুলে দিলেন ওসমান সাহেব।
বছর কয়েক ধরে কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছে এই শহরে। তারা যে সকলেই শহরের বাসিন্দা, তা নয়, শহরের বাইরে থেকে লোক আসছে আত্মহত্যা করে শহরের রাস্তায় পড়ে থাকার জন্যে। লোকে আত্মহত্যা করার জন্যে সাধারণত বিছানাকে বেছে নেয়— ঠাণ্ডা মাথায় যারা আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের কথা আমি বলছি— কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে কেন মরছে পটাপট করে এবং পকেটে রেখে দিচ্ছে আত্মহত্যার চিঠি— এইটাই ভাবিয়ে তুলেছে শহরের লোকদের।
ব্যাপারটা নিয়ে লম্বা লেকচার দিয়ে গেলেন দুর্যোধন, মাহাতো। এই অঞ্চলের পয়লা সারির রাজনৈতিক নেতা। জন্মসূত্রে সাঁওতাল— কিন্তু নিরক্ষর অথবা নিষ্প্রভ নন মোটেই। সাঁওতালি ওষুধ নিয়ে ইংরেজিতে একটা মোটা বই লিখে সাড়া ফেলেছেন— দুই ডাক্তারই দেখলাম তাঁকে খুব খোসামোদ করে চলেছেন— মূলে যে তাঁর ওষধি বিদ্যার ভাঁড়ার, তা বুঝলাম।
সন্ধ্যার সঙ্গে খুব জমিয়েছিল কবিতা। আমি মানুষকে বুঝি উপর উপর আমার বউটি

মানুষকে বোঝে তলায় তলায়। তাই আসর ভেঙে যাওয়ার পর মুখ মুচকে বলেছিল।
ইন্দ্রনাথকে— "ক্যারেকটারলেস ব্যাচেলর, মেয়েটা সম্পর্কে সাবধান। নামটাই খারাপ। সন্ধ্যা ! ব্রহ্মার মন থেকে যার আবিভাব—অথচ ব্রহ্মাই যাকে দেখে কামমোহিত হয়েছিলেন। চৌষট্টি কলার জন্ম দিয়েছে এই সন্ধ্যা ছলাকলার অভাব নেই ভাঁড়ারে। সাধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র, তুমি সাবধান !"

মুখ শুকনো রণ চৌধুরী বলেছিলেন—"আমিও সাবধান হলাম।"

আমি বললাম— "সন্ধ্যার মধ্যে দোষের কী দেখলে ?"

খরখরে চোখে তাকাল কবিতা— "যে মেয়ে হিট-সেন্সিটিভ টি-শার্ট পরে, বুকে প্রজাপতির লেবেল লাগায় শরীরের গরম দিয়ে প্রজাপতির রঙ পালটানোর জন্যে, তাকে কি পুজো করব ?"

"সন্ধ্যাকেই তো সন্ধের সময়ে পুজো করে মেয়েরা।"

নাক সিটকিয়ে উঠে গেছিল কবিতা।

রেঞ্জ অফিসারের বউ চিত্রা এই কথাটারই জের টেনে নিয়ে বললে পরের দিন রাতের আসরে— "যাই বলুন আর তাই বলুন, এতগুলো ব্যাচেলর এক জায়গায় কখনও দেখিনি—একা সন্ধ্যা কত সামলাবে !" ফ্যাশন ম্যাগাজিনে যেসব মেয়েদের ছবি দেখা যায়, তাদের তুলনায় চিত্রা মেয়েটাকে গাঁইয়া বলা চলে। নইলে এত মোটা সিঁদুর টানে ? আধুলি সাইজের টিপ পরে ? তবে কথা বলে চোখা চোখা— বঁটির দিকে না তাকিয়েই ঘচাঘচ করে আনাজ কাটতে কাটতে বলে গেল কথাগুলো। মনের আনন্দে রান্নাঘর ছেড়ে বঁটি নিয়ে চলে এসেছে আড্ডার ঘরে— বসেছে মেঝেতে।

কবিতা ফোড়ন দিল তক্ষুনি—"দেখলে তো ? পুলিশ সাহেব, এক ডাক্তার, শিকারি আর এই গোয়েন্দা— চার-চারটে ব্যাচেলর। আসকারা তো পাবেই সন্ধ্যা। বেহায়া কোথাকার! নাগর খুঁজছে, প্রজাপতি লেবেল লাগিয়ে।" ইন্দ্রনাথ উদাসচোখে কড়িকাঠের মস্ত টিকটিকি দেখতে লাগল ।

রণ চৌধুরী কোলের উপর রাখা ম্যানলিকার কোম্পানিররাইফেলটায় আরও বেশি মনোনিবেশ করলে। আমি মুখ খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ ঘটক বলে

উঠলেন— “বৌদির সিক্সথসেন্স ঠিকই ধরেছে। সন্ধ্যা মেয়েটা সুবিধের নয়।”
বঁটিতে হাত থেমে গেল চিত্রার- “তুমি কী করে জানলে ?”
“একইসঙ্গে পড়েছি যে কলেজে।”
“অ্যাঁ !”
“আঙুল কেটে ঝুলবে এবারে— মাছ ভাজাও জুটবে না শেষকালে।” বঁটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল চিত্রা। বললে কবিতাকে— “চলুন দিদি, আমরা রান্নাঘরে বসি।” চৌকাঠ পেরনোর সময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে গেল স্বামী দেবতাকে— “খেদিয়ে দিয়েছিল বলেই তো আমাকে পাকড়েছ । ” টিকটিকিটা এই সময়ে ‘ঠিক, ঠিক’ বলে পালিয়ে যেতেই চোখ নামিয়ে বললে, ইন্দ্রনাথ- “সত্যি ?”
“কোনটা সত্যি ?” প্রকাশ ঘটক হাসিমুখে বললেন- “আমার পত্নীর কুসন্দেহ, না, সন্ধ্যার কুকথা ?”
উগ্র জার্মান গোঁফ নাচিয়ে টিপ্পনী কাটলেন রণ চৌধুরী— “খনার বচন আর টিকটিকির ভাষণ নাকি সত্যি হয় ?”
প্রকাশের বয়স তিরিশের কোঠায় । মুখচোখ দেখেই বোঝা যায় ভাল ছেলে ।
পরিচয় জমে ওঠার প্রারম্ভেই জানিয়েছিলেন, বিদ্যার পরিমণ্ডলেই তাঁর কাছে অধিকপ্রিয়— জঙ্গলের চেয়ে। পেটের দায়ে চলে এসেছেন এই কাজে মন সায় দেয়নি। মূল্যবোধের বালাই কেউ রাখছে না এ যুগে— প্রকাশ সেই মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছেন । বিশেষ করে এই সরকারি চাকরিতে। সংক্ষেপে, ছেলেটি সৎ, সজ্জন, শ্রমনিষ্ঠ। হেসেই বললেন— “আমি যখন বম্বের এলফিনস্টোন কলেজে বিএসসি পড়ছি , এই সন্ধ্যা ছিল আমার সহপাঠিনী। শুধু একটা ঘটনা বলছি— ওর চরিত্র কীরকম আঁচ করতে পারবে— এর বেশি বলতে পারব না। করিডরে একদিন গলা ফাটিয়ে হাহুতাশ করতে শুনলাম। প্রফেসর আর স্টুডেন্টরা গিজগিজ করছে— তাদের মধ্যেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে সন্ধ্যা— হায় ভগবান ! কী হবে এখন ? জন্মনিরোধক বড়ি খেতে যে ভুলে গেছিলাম !”
রণ চৌধুরীর উগ্র জার্মান গোঁফ খাড়া হয়ে গেল ।
প্রকাশ বললেন- “এই হল সন্ধ্যা। তারপর ছিটকে গেছিলাম। এখানে চাকরিতে এসে ফের

দেখলাম। ও যে ডাক্তারের বোন, তা জানতাম না। শহরে গিয়ে ডি, এফ. ও-র ঘরে দূর থেকে দেখেই চিনেছি— আমাকে দেখেনি দেখলেই ছুটে আসবে— দাম্পত্য-দাঙ্গা লাগাবে। ও সব পারে।"

নির্নিমেষ চেয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। ওর মনে যে একটা বিশেষ চিন্তা খেলছে, তা চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। এমন সময়ে নিশীথ নৈঃশব্দ্য ভেঙে গেল। বাংলোর বাইরে গাড়ির আওয়াজ শুনলাম।

প্রকাশ উঠে গেল— "এত রাতে আবার কে ?" ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পিছন পিছন ঘরে ঢুকলেন দুর্যোধন মাহাতো— পলিটিকাল লিডার।

হাত জোড় করে সবাইকে নমস্তে জানিয়ে বসে পড়লেন নেতামশাই।

প্রবীণ মোটেই নন। যৌবন যেতে গিয়েও যেন আটকে গেছে— করিৎকর্মা মুখচ্ছবিতে বন্দি হয়ে আছে। ঘাগু লিডার। অতিশয় অমায়িক। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময়। যেন বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাওয়াতে পারেন। আলগোছে কথা বলছিলাম এতক্ষণ আয়েশ করে বসে। লিডারের আবির্ভাবে শিরদাঁড়া শক্ত করতে হল। 'পলিটিক্সে টাইম ইজ মানি।'

সত্যিই হাতঘড়ি দেখলেন দুর্যোধন মাহাতো । বললেন- "রাত হয়েছে। মাছভাজার গন্ধ পাচ্ছি। বেশি সময় নেব না।"

প্রকাশ বললেন— "খেয়ে যাবেন আজ আপনাকে ছাড়ছি না।"

দুর্যোধন বললেন— "আমি তো আছি, দেখাও হবে। কিন্তু এঁদের কর্তব্য শুরু হওয়ার আগে আমার কর্তব্যটা সেরে যাই।"

ইন্দ্রনাথ বললে- "আমাদের কর্তব্য জঙ্গল ভ্রমণ আর হাতির ফুলশয্যা দেখা ।"

কষ্টিপাথর মুখে সাদা ঝিনুক-দাঁত ঝলসিয়ে হাসলেন দুর্যোধন— "সেইসঙ্গে রহস্যভেদ। "

রণ চৌধুরীর দিকে আঙুল তুলে- "এঁর রহস্য। গাছের পাতায় কেন গ্রিজ !"

"আর কেনই বা খুন করার চেষ্টা হয় তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে," বললেন ইন্দ্রনাথ।

"ওঁর সঙ্গে তখন যদি আমার আলাপ হত— রহস্যভেদ করে দিতাম তক্ষুনি। উনি যখন শঙ্খচূড় মারছেন, তার দিন সাতেক আগেই গেছে বুদ্ধপূর্ণিমা। এই তল্লাটের সমস্ত আদিবাসীরা তিনদিন ধরে উৎসব করে ওই সময়ে। চারদিক থেকে দলে দলে আসে শিকার করতে। শুয়োর, হরিণ, খরগোশ, শজারু— কিছুই বাদ দেয় না। শিকারের নিষেধ তখন

থাকে না। পাহাড়ের উপর তিনদিন, তিনরাত ধরে জ্বলে আগুন ঝলসানো হয় মাংস— জালাভর্তি হাড়িয়া থাকে সঙ্গে।

"মিঃ চৌধুরী, বাতাসে সেই মাংস পোড়ার কিছু ভুষো আর চর্বি আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে গাছের পাতায় লেগে থাকে। এটা বৃষ্টির সময় নয়। তাই আপনার গায়ে আর জামায় লেগে গেছিল। এর মধ্যে রহস্য কোথায় ? আমি তখন পঞ্চায়েতি মিটিং করতে বেরিয়েছিলাম— ফিরে এসে সব শুনলাম— তখন আপনি চলে গেছেন।

"এখন যখন এসেছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে নিয়ে তখন নিশ্চয় ওই ব্যাপারটাই আপনাদের মাথায় ঘুরছে— তাই আপনাদের অযথা সময়ের অপব্যয় বন্ধ করতে এলাম।"

রণ চৌধুরীর হিংস্র গোঁফ নেচে উঠল— "তাহলে আমাকে টিপ করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল কেন ?"

"পোচার-টোচার কেউ হবে। ওরা বড় নিষ্ঠুর। যাকে তাকে মেরে দেয়— প্রমাণ রাখতে চায় না। আপনাকে দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়েছিল।"

"ভয় পেলে আমার গাড়ির পাশে তার গাড়ি রাখতে যাবে কেন ?"

"স্রেফ কৌতূহল হতে পারে। তার এলাকায় হঠাৎ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ দেখে ভয় পেয়েছিল মনে হয়।"

"দুর্যোধনবাবু, রাজনীতি করার সুবাদে সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকে ?"

"তা থাকে।"

"এই পোচার কে হতে পারে, আপনি জানেন না?"

আস্তে মাথা দুলিয়ে দুর্যোধন বললেন—"সেইটাই জানবার চেষ্টা করছি আর সেই কথাটা বলতেই আপনার কাছে এলাম । বিহারের বর্ডার, এখান থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ইলেকট্রিক কাঁটা তার কেটে ফেলে এদিকের বনের সম্পদ লুঠ করে। নিয়ে চলে যাচ্ছে ওদিকে। এসব অনাচার বন্ধ করা দরকার। তার উপর শুরু হয়েছে সুইসাইডের হিড়িক। সঞ্জয় ভঞ্জ এইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। শান্তি যাতে থাকে— আমাকে তা দেখতে হবে। পুলিশ একা পারবে না।"

"সঞ্জয় ভঞ্জর টনক তাহলে নড়েছে সুইসাইড হিড়িক নিয়ে ?" বললে ইন্দ্রনাথ— থেমে

থেমে।

"ওঁর আগমনই তো এই মিষ্ট্রি সলভ করার জন্যে।"

"স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট ?"

"হ্যাঁ। সবাই তা জানে না, কিন্তু আপনাকে জানাতে বাধা নেই। বড় তুখোড় অফিসার। নজর চারিদিকে।" উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে এলেন দুর্যোধন— "উনি একটা হিটলিস্ট বানিয়েছেন— সন্দেহ করছেন যাদের, তাদের লিস্ট আমার সাহায্য দরকার হতে পারে বলে আমাকে জানিয়ে রেখেছেন। নামগুলো পাঁচ কান না হয়।"

"নির্ভয়ে বলুন।"

"মাত্র দুটো নাম। এদের একজন ডক্টর ডেথ।"

"ড-ক্টর ডেথ ?"

"ইয়েস স্যর। সঞ্জয় ভঞ্জ অপরাধ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ— শখের রহস্যসন্ধানীদের অনুকম্পা করেন। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনাকে উনি ভাল চোখে দেখেননি। সে কথাও আমাকে বলেছেন। আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম— কারণ আপনার কীর্তিকাহিনী, মৃগাঙ্কবাবুর কলমের দৌলতে এই বনজঙ্গল পাহাড়েও পৌঁছোয় । আমি আপনার প্রতিভার পূজারী।"

"ধন্যবাদ । সঞ্জয় ভঞ্জর কথা বলুন।"

"ওঁর উপর রুষ্ট হবেন না। অল্প বয়স । বিলেত আমেরিকায় অনেকদিন কাটিয়েছেন। বাংলা ভাষায় জ্ঞান নেই বললেই চলে— পড়াশুনো দূরের কথা। দেশের কুলাঙ্গার । যাক গে, এসব কথা এই চার দেওয়ালেই আটকে থাকুক। ডক্টর ডেথের নাম শুনেছেন উনি আমেরিকায়।"

"কোন ডক্টর ডেথের নাম শুনেছেন ?"

চমকে উঠল দুর্যোধনের সদা সজাগ চোখ "কটা ডক্টর ডেথ আছে আমেরিকায় ?"

"দুটো।"

"আপনি মনে হচ্ছে সঞ্জয় ভঞ্জর চেয়ে বেশি। জানেন ?"

"এতক্ষণে সেটা মনে করতে পারলেন ? মিঃ চৌধুরী, আপনার আখাম্বা চুরুট একটা বের করুন। —হ্যাঁ, দুজন ডক্টর ডেথ । একজনের মুন্ডু ধড় থেকে আলাদা হয়েছে গিলোটিনের ছুরিতে— ফরাসি ডক্টর ডেথ— কিন্তু কাহিনীটা অমর হয়ে রয়েছে আমেরিকান কেতাবে।

আর একজন খাঁটি আমেরিকান-প্যাথলজিস্ট ডাক্তার এখনও চলছে তাঁর বিচারের প্রহসন।"
দুর্যোধনের সাদা চোখদুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েছে এতক্ষণে । দুঁদে পলিটিশিয়ানদের চোখ। কিন্তু সব সময়ে ঠাণ্ডা থাকে— অবাক হয়েছেন বোঝা যায় না। দুর্যোধন তাহলে তেমন পোড় খাওয়া নন ?
বললেন- "সঞ্জয় ভঞ্জ এই প্যাথলজিস্টের কথাই বলছিলেন। যারা আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের উনি মরার সুযোগ করে দেন। "
"এক কথায় তাকে কী বলে ?"
"ইউথানেসিয়া," আস্তে বললেন দুর্যোধন।
"হ্যাঁ। করাল রোগ যাদের হতাশ করে তোলে— ডক্টর ডেথ-কে খুঁজে বের করে তারাই। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের পন্থা বাতলে দেন। ফাইন ! সঞ্জয় ভঞ্জর হিসেবে তাহলে এখানকার ডক্টর ডেথ দু'জন—" বলে থেমে গেল ইন্দ্রনাথ ।
পাদপূরণ করে দিলেন দুর্যোধন—"অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য।" কথা না বলে চুরুটে সুখটান দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। চোখ রয়েছে কিন্তু দুর্যোধনের চোখের উপর। এই সেই চোখ যার মধ্যে কমলহিরের দ্যুতি দেখা যায় মাহেন্দ্র মুহূর্তে।
এখনও তাই দেখা যাচ্ছে।
চুরুট নামাল ইন্দ্র— "হিট লিস্টে আর কার নাম আছে দুর্যোধনবাবু ?"
চোখ নামিয়ে নিলেন দুর্যোধন। তারপর চোখে চোখে চেয়ে বললেন— "সঞ্জয় ভঞ্জ একটু অযথা সন্দেহ করেন। তৃতীয় আর শেষ নামটায় বাড়াবাড়ি করেছেন।"
"গোয়েন্দাদের কাজ তাই। প্রথমে সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। তৃতীয় নামটা কার ?"
"সন্ধ্যা আচার্য।"
আমি নিশ্চয় চমকে উঠেছিলাম। কেননা, কাঠখোট্টা রণ চৌধুরী যেন সোফা ছেড়ে ইঞ্চিখানেক উপরে উঠে গেলেন নামটা শুনেই ।
নিথর রইলেন কেবল প্রকাশ ঘটক।
তরল হল ইন্দ্রর মুখের শক্তভাব। হাসল। বলল— "খুবই খারাপ মেয়ে ছিল।"
সচমকে বললেন দুর্যোধন—"আপনি জানেন ?"
"শখের রহস্যসন্ধানী বলেই জানি।" "অভিমান আপনার এখনও গেল না ? সত্যিই

রক্তমাংসের গোয়েন্দা আপনি— অতিমানুষ নন। আপনাকেই শুনিয়ে রাখি আর একটা খবর — যা সঞ্জয় ভঞ্জকেও বলিনি। —সন্ধ্যা আর মনোহরকে দেখে আপনার কী মনে হয়েছে ?"

"আমি যেটা অনুমানে বলব, সেটাই আপনার জানা খবর, এই তো ?"

"যা বলেন।"

"সন্ধ্যা মনোহরের মায়ের পেটের বোন নয়। "

নড়ে বসলেন দুর্যোধন— "আশ্চর্য ! চোখ বটে আপনার। একজন কালো, আর একজন। ফর্সা। একজন বেঁটে, আর একজন লম্বা।"

"জীন বিজ্ঞানের হিসেবে কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না চলচেরা বিচারে। "

"অবৈধ সহাবস্থান নয় তো ?"

"আপনার খবর কী বলে ?"

"স্যাংগুইন হতে পারছি না। তবে অচেতনকে পকেটে পুরে রেখেছে।"

"সঞ্জয় ভঞ্জর অনুমান ?"

ঝুঁকে পড়লেন দুর্যোধন— "ভয়ানক ।—সন্ধ্যা পার্টি পাকড়ে আনে— দুই ডক্টর ডেথ পার্টি সাবাড় করে।"

এই বলেই ঘড়ি দেখলেন এবং উঠে পড়লেন- "আজ আর নয় । দিনকয়েক আছি এখানেই — আসুন একদিন— প্রকাশবাবু বাড়ি চেনেন।"

উঠে দাঁড়ালাম আমরাও। এগিয়ে দিলাম বারান্দায়। প্রকাশ এগিয়ে দিলেন বাগানের ফটক পর্যন্ত। কালো গাড়িটা অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়েছিল। দুর্যোধন নিজেই ড্রাইভ করে চলে গেলেন।

প্রকাশ বারান্দায় ফিরে আসতেই বললে ইন্দ্রনাথ- "ওটা কী গাড়ি ? অদ্ভুত দেখতে।"

হেসে বললেন প্রকাশ—"দেবতাদের মাহাত্ম্যের চেয়ে তাঁদের বাহনদের মাহাত্ম্য কম যায় না। দুর্যোধন মাহাতোর এই বাহনটি আদতে একটা জিপ। উনি তাঁকে ভ্যান বানিয়েছেন। একাধারে মালগাড়ি আর পার্টির গাড়ি—বনেজঙ্গলে, পাহাড়ি রাস্তায় এমন গাড়িই দরকার।"

"চালচলন তো জমিদারের মতো।"

"জমিদারই তো—এ যুগের'বক্র হাসলেন প্রকাশ—"ভিতরে আসুন, একটা জিনিস দেখাচ্ছি।"

গেলাম প্রকাশের সঙ্গে ওঁর কোয়ার্টারে । শোবার ঘরের পিছনে ছোট একটা ঘরের দরজা

খুলে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বললে—“দেখুন।”

ছোট্ট ঘরটার তিনদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বল্লম। গোছাগোছা বল্লম। ঘর ভর্তি। মেঝে পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। ঘরে পা দেওয়ার জায়গা নেই। সবই নতুন। ঝকঝক করছে ফলা।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বললে প্রকাশ—ওঁর স্টক এখানে থাকে। এখান থেকে বিলি হয়। জঙ্গল রক্ষীদের দেওয়া হয়। জঙ্গলের হার্বস ইত্যাদি তারা রক্ষে করে সরকারের রোজগার বাড়ায়—সেইসঙ্গে বাড়ায় নিজেদের—"

“আর বাহিনী বাড়ে দুর্যোধনের”, ইন্দ্রনাথের সহাস্য মন্তব্য।

“রাজ্য রাখতে গেলে এ সবই দরকার। আমরা হুকুমের চাকর।”

“উনি এখানেই থাকেন ?”

“হ্যাঁ। যাবেন ? কাল সকালে প্রোগ্রাম করা যাবে।” পরের দিন সকালে ভেঙে পড়ল রণ চৌধুরীর মজবুত শরীর। ঘন ঘন টয়লেটে দৌড়তে লাগলেন। দশ ফোঁটা ক্লোরোডাইন গিলিয়ে দিয়ে, ওঁকে ফেলেই আমরা গেলাম পাহাড়ের গায়ে দুর্যোধনের বাড়িতে। মাটির বাড়ি —অনেকগুলো। বাগান দিয়ে ঘেরা। গ্যারেজটাও মাটি আর টিন দিয়ে তৈরি। অদ্ভুত জিপটা মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে—পিছনটা ঢুকে রয়েছে ভিতরে। প্রথম আটচালায় বৈঠকে বসেছিলেন দুর্যোধন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে কালোমানুষের দল। আমাদের দেখেই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। পাশের একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। চা আনতে হুকুম দিলেন।

ইন্দ্র বললে—“আজ দেখছি খুব ব্যস্ত। ”

“আর বলেন কেন—অনেক দিন পর এলাম তো"

“আর একদিন আসা যাবে। বেশ জায়গা ।”

“লেখক মানুষ,খোরাক পাবেন অনেক।”

আমি বললাম—“লেখক তো আপনিও।”

“সে তো ওষুধের বই। ইংরেজি।”

“দুর্লভ বিষয়। সাঁওতালি মেডিসিনের খবর ক’জন রাখে ? আছে আপনার কাছে ?”

“এনে দিচ্ছি।”

ইন্দ্রনাথ চিমটি কেটে বললে—“মৃগ,তোমার এই এক ব্যারাম। এসেছ বেড়াতে বই নিয়ে মেতো না।”

মোটা একটা বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন দুর্যোধন। বিশ্বকোষ সাইজের বিরাট বই। বইটা আমার। হাতে দিতেই এক চ্যালা এসে ডাকল পিছন থেকে। বেরিয়ে গেলেন উনি। বইপাগল ইন্দ্র নিজেও। প্রকাশ ঘটকও কম যান না। তিন জনে ঝুঁকে পড়লাম স্থূলকায় গ্রন্থের উপর। খুললাম মাঝখান থেকে। টুপ করে একটা কাগজ পড়ে গেল মেঝেতে, কুড়িয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। এক পলক চাইতেই চোখমুখের চেহারা পালটে গেল।

দ্রুত হ্রস্বকণ্ঠে বললে— “কুইক, মৃগ, ক্যামেরা রেডি কর। ফটোকপি চাই—এই। কাগজটার।”

ফুলস্কেপ সাইজের একটা কাগজ। ইংরেজিতে সাইক্লোসটাইল করা—দু’পাতাজুড়ে। হুড়ো খেয়ে পড়বার সময় পেলাম না। ক্লিকক্লিক করে শাটার টিপে ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। কাগজখানাকে যথাস্থানে রেখে বই মুড়ে রাখল ইন্দ্রনাথ । নিজে তো খুললই। না—আমাদেরও খুলতে দিল না।।

চা নিয়ে এল দুর্যোধনের লোক— সঙ্গে তিনি নিজে। বড় বড় রসগোল্লা আর ক্ষীরের নাড়ু। নিমেষে প্লেট সাফ করে দিয়ে ইন্দ্র বললে—“বইটা বড্ড ভারী। আর একদিন নিয়ে যাব—আজ শুধু জঙ্গল ভ্রমণ ।”

চলে এলাম। বাস ধরে সোজা রেঞ্জ অফিসে। দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে একধামা মুড়ি নিয়ে চিবোচ্ছেন রণ চৌধুরী। এক গাল হেসে বললেন—“পেটে রাক্ষস ঢুকে গেল আপনার ওষুধ খেয়ে। প্রকাশবাবু, আমি রেডি।”

প্রকাশ ঘটকের স্কুটার বের করাই ছিল। রণ চৌধুরীও জঙ্গুলে পোশাক পরেছিলেন। মুড়ির ধামা আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে স্কুটারের পিছনে বসলেন। প্রকাশ চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রনাথ পিছন থেকে বলল–“দুর্গা ! দুর্গা !”

আমি বললাম –“তুমি জানতে ওঁরা এখন বেরবেন ? রণ চৌধুরীর পেট খারাপ হওয়াটা মিছে কথা ? কোথায় গেলেন, তাও জানো মনে হচ্ছে ?”

“জানি, কিন্তু বলব না,” বলে ক্যামেরাটা টেনে নিল আমার কাঁধ থেকে—“চললাম আমিও।"

"কোথায় ?"

"শহরে।"

সারাদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম। ঘুমের ঘোরে শুনলাম প্রকাশের মেয়েটার দাপাদাপি আর কবিতার সঙ্গে চিত্রার বকবকানি। এত বকতেও পারে মেয়েরা। শেষকালে ঘুম ছুটে গেল ঝাঁকুনি খেয়ে। চা নিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা। আড়মোড়া ভেঙে বললাম –"হে প্রেয়সী, এতদিন মুগ্ধ ছিলাম তোমার ওই মণিকর্ণিকার মতো যৌবনের জন্যে, ওই মারাঠি বুকের জন্যে, ওই মিশরীয় চোখের জন্যে, ওই গ্রিক চিবুকের জন্যে, ওই ইরানি নাক আর কাশ্মীরি ভুরুর জন্যে—আজ থেকে মুগ্ধতর হলাম। তোমার ওই হাতির শুড়ের মতো পেশিবহুল জিভখানার জন্যে। উফ। এত বকতেও পারো।"

খিল খিল হাসি শুনলাম দোরগোড়ায় । মুখ লাল হয়ে গেছিল কবিতার । কিন্তু দাম্পত্য দাঙ্গা বাঁচিয়ে দিল স্বয়ং ইন্দ্রনাথ। পিছনে ঝোড়ো চেহারা নিয়ে রণ চৌধুরী আর প্রকাশ ঘটক। একসঙ্গেই ফিরল তিনজনে—তাহলে মিটিং পয়েন্টও ছিল এক জায়গায়।

ইন্দ্রনাথ কবিতার লাল মুখ আর আমার হাসি মুখ তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে শুধু বললে,

"নারদ ! নারদ !"

রেগে প্রস্থান করল কবিতা— পিছনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চিত্রা।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলাম—"কী কাজ করে এলে ?"

"টপ সিক্রেট" বলে দরজা ভেজিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

তারপর সব শুনলাম।

রাতের আড্ডায় চুরুট নিয়ে লেকচার ঝেড়ে গেলেন রণ চৌধুরী। ইন্দ্রনাথ মৌনী হয়ে রয়েছে। মনের শক্তি বাড়ানোর দরকার হলেই ওর মুখের কথা কমে যায়। আমি তা জানি বলেই নির্বিবাদে রণ চৌধুরীর জ্ঞান গ্রহণ করে যাচ্ছি একাই। ফুল সিগার, হাফ সিগার, সিগারেল্লো। ঠাণ্ডার দিনে বিয়ারের সঙ্গে ম্যানিলা, খুব ঠাণ্ডায় উইস্কির সঙ্গে ডাচ, গরমের দিনে ইণ্ডিয়ান,বার্মা,

সুমাত্রা উইফ আর জাভা ডসেন। পানপাত্রে একটু আফিং মিশিয়ে দিলে.....

"মড়ার মতো ঘুম", বলে সটান হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। একটু থেমে ফের বললে, —"আফিং ।"

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বারান্দায় বেরিয়ে দেখি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোলে ম্যানলিকার নিয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন রণ চৌধুরী। সতর্ক কৃপাণ চক্ষু ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে নিবদ্ধ সামনে।

বললেন—“আপনার বন্ধুর মাথায় ছিট আছে।”

“কেন ?”

“আবার শহরে গেছে—বাসে। আমাকে রেখে গেল আপনাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে। প্রকাশও গেছে সঙ্গে।"

ইন্দ্রর মৌন থাকার কারণটা এবার বোধহয় আঁচ করতে পারলাম।।

ফিরল সন্ধের সময়ে।

আমরা তখন গুলতানি করছি একটা ঘরে। রণ চৌধুরী এখনও আগ্নেয়াস্ত্র ত্যাগ করেননি। দরজা বন্ধ করে বসে আছেন দরজার সামনেই। পরিহাসের মেজাজ নেই দেখে তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলছি না। কবিতা আর চিত্রা চুটিয়ে সন্ধ্যা-নিন্দা করে যাচ্ছে। বিষকন্যাদের নাকি অল্পবয়স থেকে নিশ্বেসে বিষগ্রহণ করানো হত ।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও আছে বিষকন্যার কেচ্ছা । সন্ধ্যার রাশিচক্র বিচার করলে দেখা যাবে......

ঠিক এই সময়ে টোকা পড়ল দরজায় । ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে —“দরজা খোলা হোক।”

রণ চৌধুরী দরজা খুলে দিলেন। ইন্দ্রনাথের পরিপাটি ধুতি পাঞ্জাবি লাটঘাট হয়ে রয়েছে। মুখ থমথমে। প্রকাশের মেয়ে এতক্ষণ পুতুল খেলছিল—ইন্দ্রকে দেখে তারও চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ। বললে—“একটু পরেই এখানে একটা মিটিং বসবে। মেয়েরা থাকবে পাশের ঘরে।”

কবিতা বললে—“কেন ?"

“নাটকটা এবার শেষ করে দিতে চাই বলে।”

“তুমি কী করলে সারাদিন ?”

“সন্ধ্যাকে খুঁজলাম।”

“সন্ধ্যা !”

"তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

মিনিট দশেক পরে প্রকাশ ঢুকল ঘরে । মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। অদ্ভুত ছোকরা। আমরা চার পুরুষ মুখোমুখি বসে।

ইন্দ্র বললে—"স্কুটারটা কী ভাবে আছে ?..."

"যে ভাবে দেখে গেছিলেন", বললেন প্রকাশ —"গ্যারেজে শুধু একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। এখনও ঝুলছে । চাবি আমার কাছে।"

ঘর ফের নিস্তব্ধ । আমি কৌতুহল প্রকাশ করলাম না। হাওয়া অন্যরকম। বিদ্যুৎগর্ভ পরিবেশ।

ন'টার সময়ে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। বাংলোর বাইরে থেমেছে।

উঠবার আগে ইন্দ্র জিজ্ঞেস করল প্রকাশকে—"গাড়ি পার্কিং-এর কী ব্যবস্থা করেছেন ?"

"বাংলোর সামনে কাটা কাঠ ফেলে রেখেছি– কোনও গাড়ি দাঁড়াতে পারবে না। দূরে রাখতে হবে।"

"দূরত্ব নিরাপদ ?"

"হ্যাঁ।"

জুতোর শব্দ উঠে এল বারান্দায়। রণ চৌধুরী দরজা খুলে ধরেছিলেন।

প্রথমে চৌকাঠ পেরিয়ে এলেন ডি এফ ও প্রদীপ কাঞ্জিলাল। ঈশ্বর তাঁকে জন্মাবধি হাস্য-প্রক্রিয়া শেখাননি। এই মুহূর্তে তিনি সকুমার রায়ের আঁকা ছবির সজীব সংস্করণ হয়ে রয়েছেন এবং উৎকট গম্ভীর । গণ্ডারোচিত পদক্ষেপ কিন্তু বিস্মৃত হননি। মেঝে কাঁপিয়ে ঢুকলেন ঘরে। ঢিবি কপাল কুঁচকে বললেন গ্রামভারী গলায়– "এসেছে ?" "না। তবে আসবে। আসতেই হবে । "

এঁর পিছন পিছন ঢুকলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য। পুলিশ কর্তা সঞ্জয় ভঞ্জ—ডানহিল পাইপ কড়মড় করে চিবিয়ে চলেছেন।

সবশেষে থপথপ করে অতিকায় শরীর টেনে নিয়ে এলেন ওসমান সাহেব । সবাই বসলেন —খাড়া রইলেন শুধু সঞ্জয় ভঞ্জ। দুই নয়নে সীমাহীন তাচ্ছিল্য বিকিরণ করে বললেন- "কোথায় সেই স্কুটার ?"

তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রকাশ । ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। নিস্তব্ধ ঘরে

আমরা তখন চুপচাপ বসে। বসলেন সঞ্জয় ভঞ্জ। বললেন, —"ঠিক আছে। নো প্রব্লেম।"

এক-একটা সেকেন্ডকে মনে হচ্ছিল ব্রহ্মার এক-একটা বছর। কাটতে যেন আর চায় না ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পাথরের স্ট্যাচুর মতো বসে আছে ইন্দ্র।

গাড়ি থামল বাইরে। জুতোর আওয়াজ উঠে এল বারান্দায়। দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকলেন দুর্যোধন মাহাতো।

ইন্দ্রনাথ শুধ বলল-"ওইখানে বসুন।"

দুর্যোধন তক্ষুনি বসলেন না। স্লোস্পিড চোখ। ঘুরিয়ে দেখলেন ঘরের সব ক'জনকে। মুখের ভাব রইল অবিচল। বসলেন তারপর। বললেন সহজ গলায়— "ব্যাপারটা কী ?"

সঞ্জয় ভঞ্জ পাইপ নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন— "টয়লেটটা ঘুরে এসে আমি বলছি । — প্রকাশবাবু, কোনদিকে যাব ?"

"চলুন।"

দুজনে বেরিয়ে গেলেন। ইন্দ্রনাথ বললে—"আপনার সঙ্গে কয়েকটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। কাল আমরা চলে যাব । তাই আজ রাতেই এই গেট টুগেদার।"

"গেট-টুগেদারের তো লক্ষণ দেখছি না। আমি ব্যস্ত মানুষ। সংক্ষেপে সারুন, দুর্যোধনের স্বর ঈষৎ কঠিন। চোখ কিন্তু ঠাণ্ডা।

"আপনার কনট্রাসেপটিভ পিল-এর গবেষণা কদ্দুর ?"

চেয়ে রইলেন দুর্যোধন। ঠোঁটের কোণে জাগ্রত ক্ষীণ বিদ্রুপহাস্য।

—"আপনি ব্যাচেলর বলেই কি ব্যাপারটায় ইন্টারেস্টেড ?"

"এই দুই ডক্টর ডেথ-ও ইন্টারেস্টেড," অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্যকে দেখাল ইন্দ্রনাথ। নড়ে বসলেন দুজনে। অচেতনের শীর্ণ মুখাবয়বের কুটিল চোখে একটা ছায়া ভেসে গেল। মনোহর আচার্যর আবলুস মুখ আরও ঘোর হল— এই প্রথম তাঁর চোখে দেখলাম গুলবাঘ চাহনি আকৃতির সঙ্গে চোখ খাপ খেয়েছে এবার।

ধীরে ধীরে চোখ আর মুখের চেহারা পালটে গেল দুর্যোধনের । চোখের পাতা না ফেলে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন ইন্দ্রর দিকে। এক্কেবারে অপলক। একটানা বেশ কিছুক্ষণ । তারপর বললেন কঠিন গলায়—"ষড়যন্ত্র !"

"ষড়যন্ত্র দিয়ে ষড়যন্ত্র উদঘাটন । "

প্রকাশ ফিরে এলেন আগে। পিছনে আই পি এস অফিসার। রুমাল দিয়ে হাত মুছছেন। পাইপ সঞ্চরমাণ হয়েছে ঠোঁটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। বললেন কড়মড়িয়ে।
—"ও.কে। এবার একজিবিট নম্বর ওয়ান-কে আনা হোক।"
প্রকাশ বললেন – "খবর দিয়েছি। আসছে ।"
কোয়ার্টারের দিক থেকে শোনা গেল অস্ফুট হাসির তরঙ্গ। একাধিক নারীকণ্ঠ হেসে লুটিয়ে পড়ছে। নিস্তব্ধ অরণ্য রাত্রে চলছে রঙ্গালাপ।

হাসি আর পদশব্দ এগিয়ে এল। ঢুকল ঘরে । আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিন মহিলা। চিত্রা আর কবিতা হাসি গোপন করার চেষ্টা করছে এতগুলো পুরুষের সামনে— কিন্তু দুজনেই এক-এক হাতে কোমর জাপটে ধরে রেখেছে মাঝের মহিলাকে।
সন্ধ্যা।
এতক্ষণ নিশ্চয় হাসছিল। এখন তা অন্তর্হিত হয়েছে। ফুঁসে উঠেছে। বুকের প্রজাপতি রঙ পাল্টাচ্ছে। গনগনে চোখে দেখছে দুর্যোধনকে।
কালো,মুখ থেকে হঠাৎ রক্ত নেমে গেলে। মুখবর্ণ কী রকম হয়, দুর্যোধনের মুখ দেখে সেদিন তা জানলাম। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যা আর দুর্যোধন।। শানানো গলায় বললে সন্ধ্যা—"ডক্টর ডেথ ! আপনাকে অবলাইজ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। পালিয়ে এলাম। তবে আপনার চা খেয়েছি।"
"কীসের চা ?" ইন্দ্রর প্রশ্ন।
"জঙ্গলের জড়িবুটির রস মিশোনো চা—যে চা রোজ একবার করে মাসখানেক পেটে গেলে তিন-তিনটে বছর নিশ্চিন্ত—কমপ্লিট সেক্সুয়াল ফ্রিডম। ব্রেজিলের ইণ্ডিয়ানরা জানে সেই জাদু —আর জানেন ইনি।"
"আপনি খেতে গেলেন ? কেন ?..."
"অদ্ভুত প্রশ্ন ! আমি যে বিষকন্যা। আমি যে হাফ কল-গার্ল। পঞ্জাবের প্রমীলা যদি প্যামেলা হয়ে বৃটিশ সরকারকে কাঁপিয়ে দিতে পারে আমি কেন পারব না ভারত কাঁপাতে ? কলেজ লাইফে আমিই তো চিৎকার করে বলেছিলাম —হোয়াট উড হ্যাপেন টু মি নাউ। আই ফরগট টু টেক কনট্রাসেপটিভ পিলস!"

"ওটা তো আপনার কথা নয় —প্রমীলা ওরফে প্যামেলার কথা। আপনি নকল করে চমক সৃষ্টি করেছিলেন।"

ঠোঁট কামড়ে হাসি সামলে নিল সন্ধ্যা– "কিন্তু দুর্যোধন মাহাতো ভেবেছিলেন সব সত্যি। যেমন সবাই ভাবে। তাই আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেলেন জঙ্গলের ডেথ হাউসে।"

"ডেথ-হাউস !"

সবাই জানে অবশ্য অন্য নামে– ফ্যাক্টরি। বাড়ি। হার্বস থেকে ওষুধ বানানোর কারখানা। আগে এক সাহেব ওখানে বয়লার বসিয়েছিলেন একই ইচ্ছে নিয়ে—সাঁওতালি মেডিসিনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করবেন বলে—এখনও আছে সেই বয়লার,হার্বস রাখবার গুদোম, বিশাল উনুন—আর চিমনি।"

"এখন কী হয় সেখানে ?"

ছিটকে যেতে গেল সন্ধ্যা। দুপাশ থেকে আরও জোরে চেপে ধরল চিত্রা আর কবিতা। দাঁতে দাঁত পিষে বললে সন্ধ্যা— "মানুষ পোড়ানো।"

"মানুষপোড়ানো আগুন দিয়ে বয়লার ফোটানো হয় ? হাড়গুলো ?"

"মাটির তলায়—যেখানে হার্বস রাখা হত।"

"মরা মানুষও আছে নাকি ?"

"চুন দিয়ে চাপা আছে।"

"চুন ! এত চুন যেত জঙ্গলে ? ওসমান সাহেব, আপনি চুন সাপ্লাই দিয়েছেন নাকি ?"

"বস্তা, বস্তা", বললেন ওসমান সাহেব । তাঁর গলা বসে গেছে।

"কাকে ?"

"ওই ওঁকে," দুর্যোধন মাহাততাকে তর্জনী সঙ্কেতে দেখালেন ওসমান সাহেব।

"অন্যায়, খুব অন্যায়। আমরা অবশ্য ওঁর মাটির বাড়ি দেখে এসেছি, চুনের কাজ সেখানে নেই। তাই তো সন্দেহ হয়েছিল। অত চুন কী কাজে লাগাচ্ছেন এতদিন ধরে। নিশ্চয় আপনার অদ্ভুত জিপে করে নিয়ে যেতেন। দুর্যোধনবাবু ? কথা বলবেন না ? কিন্তু চুন যে পড়ে রয়েছে জিপের মধ্যে। এই মাত্র সন্দেহ ভঞ্জন করে এলেন সঞ্জয় ভঞ্জ। সন্ধ্যা আচার্য নিশ্চয় চুনের বস্তা দেখেছেন ডেথ হাউসে ?"

"অনেক। যে ঘরে আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল।"

"কী সর্বনাশ ! কেন জানতে পারি ?"

"দেশের কাজে লাগাবেন বলে। আমাকে মাতাহরি বলবেন বলে। নারী গুপ্তচরের নাকি খুব দরকার। কেচ্ছা ফাঁস করবেন কেচ্ছা বানিয়ে।"

"কনট্রাসেপটিভ চা খাইয়ে তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল ?"

"সেই ক্ষেত্রে উনিও বিচরণ করবেন—অভয় দিয়েছিলেন।"

"বাঃ ! বাঃ ! যদি রাজি না হতেন ?"

"ডেথ চেম্বারে ঢুকতে হত।"

"সেটা কোথায় ?"

"অদ্ভুত জিপের পিছনে।"

"জিপের পিছনে ডেথ-চেম্বার ! প্রাঞ্জল করবেন ?"

"চওড়ায় মাত্র এক ফুট—ভিতরে একটা চেয়ার। বাইরে থেকে মনে হয় মালপত্র রাখবার জায়গা। কিন্তু ভিতরে আছে কার্বনমনোক্সাইড ছাড়ার ব্যবস্থা।"

"হরিবল ! মানুষ মারার কল । আপনাকে ওখানে ঢোকাতেন ?" "লাশটা পথেঘাটে ফেলে রাখতেন। পকেটে থাকত আমাকেই দিয়ে লেখানো আত্মহত্যার চিরকুট।"

"শহরে আত্মহত্যার হিড়িকের মূলে তাহলে এই ডেথ-চেম্বার ?"

"হ্যাঁ। এটাও ওঁর দেশসেবা। সমাজের বোঝা কমিয়ে দিতেন জরাগ্রস্তদের টাকা নিয়ে—সেই টাকা খরচ করতেন সমাজকল্যাণে।"

"রবিনহুডের মাসতুতো ভাই ! দুর্যোধনবাবু, ডক্টর ডেথ তাহলে অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য নন—আপনি নিজে। সন্ধ্যাকে খতম করে সন্দেহ ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ওঁদের দিকেই ?"

দুর্যোধন এখন প্রস্তর মূর্তি।

ইন্দ্রনাথ বললে সঞ্জয় ভঞ্জকে,"মিছে কথা বলা অন্যায়। কেন বলেছেন ওঁকে—আপনার হিটলিস্টে আছে দুই নিরীহ ডাক্তার আর এই অবলা মেয়েটার নাম ?" "আসল টার্গেট যাতে নিশ্চিন্ত থাকে । ইনফরমেশন পেয়েই এসেছি—রাঘববোয়ালের খেলা মশায়—কিসসু করা যাবে না।"

এই প্রথম ভারী গলায় কথা বললেন দুর্যোধন—"এখনও কিছু করতে পারবেন না।"

“তাতো বটেই, তাতো বটেই,” মধুক্ষরা কণ্ঠস্বরে জবাব দিল ইন্দ্রনাথ,“সন্ধ্যা মদ খেতে চেয়েছে—আপনি তাকে মদ খাইয়েছেন—ও কী করে জানবে মদে ছিল আফিং ? স্বেচ্ছায় যারা আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, তাদেরও তো এইভাবে বেহুঁশ করে পুরেছেন ডেথ-চেম্বারে । আফিং যেখান থেকে রেগুলার কিনেছেন—সেখানকার রেকর্ডও হাতিয়েছেন যে আই.পি.এস সাহেব।”

“তাহলেও আমার চুল ছুঁতে পারবেন না।”

“তা ঠিক। নেতা বলে কথা। মড়াপোড়ানো তেলচর্বি চিমনি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল গাছের পাতায়—রণ চৌধুরী বেশি কৌতুহল দেখাতে গিয়ে মরতে বসেছিলেন আপনার বন্দুকের গুলিতে। সেটাও প্রমাণ করা যাবে না।”

“না। কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। পণ্ডশ্রম করছেন।”

“তাই কি ? আপনার সাঁওতাল মেডিসিনের বইয়ের মধ্যে কী রেখেছিলেন দুর্যোধনবাবু ?”

টলে গেলেন মাহাতো। এই প্রথম। কিন্তু কথা বললেন না।

ইন্দ্র ছুরি শানিয়ে গেল কথার সুরে—“একটা কাগজ। দুদিকে সাইক্লোসটাইল করা। বিদেশের এক রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র। এই তল্লাটকে নিজের স্কিমে ঢালবার পরিকল্পনা। আর-ডি-এক্স এক্সপ্লোসিভ আনবার প্ল্যান। সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্লুপ্রিন্ট।”

দুর্যোধন এখন ছাইয়ের মতো বিবর্ণ।

“সে কাগজের ফটোকপি অফিসে রেখে এসেছেন সঞ্জয় ভঞ্জ। পলিটিক্স বড় লাভের ব্যবসা —কিন্তু এসব পথে আপনি কেন গেলেন দুর্যোধনবাবু ?”

“পথের কাঁটা সরানোর জন্যে।” গলা ধরে গেছে দুর্যোধনের।

“তাই আর-ডি-এক্স প্যাক করে রেখেছিলেন। প্রকাশের স্কুটারে ? স্টার্টারে কিক করলেই উড়ে যেত এই বাড়ি—প্রাণ যেত এতগুলো প্রাণীর ?” দুর্যোধন এখন বুঝি শব হয়ে গেছেন।

“ছিঃ ছিঃ !” ইন্দ্রনাথ এখন চোখে চোখে চেয়ে কথা বলছে। সম্মোহনের অদৃশ্য ঢেউ বয়ে যাচ্ছে যেন একজনের চোখ থেকে আর একজনের চোখে— “কেন ? কেন এ পথে পা দিলেন দুর্যোধনবাবু ? আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ছেলেবেলা কেটেছে আপনার দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। আপনার মাকে ডাইনি সন্দেহ করে পিটিয়ে মেরে ফেলে আসা হয়েছিল। বাঘ-নেকড়ে-অজগরের জঙ্গলে-সম্পত্তির লোভে খুন করা হয়েছিল আপনার বাবাকে। আপনি

মানুষ হয়েছেন অনাথ আশ্রমে—দেশকে ভালবাসতে শিখেছেন—কিন্তু এপথে কেন ?"
"কারণ, এদেশের আদালতে বিচার হয় না—এদেশের পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধার্মিক পার পেয়ে যাচ্ছে। ইয়ং জেনারেশন তাই দেখে অধর্মের পথেই যেতে চাইছে। আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে—যে ভাবেই হোক। জানেন কাদের মাংস পুড়িয়ে বয়লারের জল ফুটিয়েছি ? দেশের শত্রুদের । টেররিস্ট ! বর্ডার পার করিয়ে এনেছি ব্যাঙ্ককে পাচার করে দেব আশ্বাস দিয়ে,দক্ষিণা নিয়েছি লাখ লাখ টাকা ... কিন্তু পাঠিয়েছি যমালয়ে। নিপাত্তা হতেই ওরা চায়—তাই কেউ পাত্তা নেয়নি। আরও নৃশংস পন্থা জানা থাকলে, তাই করতাম। ...লাখ লাখ টাকা নিজে ভোগ করিনি,লাগিয়েছি সমাজের উপকারে । এরা সমাজের ভাইরাস,এদের মেরেছি স্টং মোটিভ নিয়ে। আরও মারব আরও স্ট্রং মনোবল নিয়ে । জঙ্গলে থাকুক জঙ্গলের আইন।"
"কংক্রিটের জঙ্গল আর গাছের জঙ্গল কি এক হল ? শহরের জংলিদের থেকে আপনাদের তফাত টা তাহলে কোথায় ?"
যেন একটা অদৃশ্য থাপ্পড় খেলেন দুর্যোধন মাহাতো।
গভীর আর্দ্র গলায় বললে ইন্দ্রনাথ—"সোজা পথে চলুন, দুর্যোধনবাবু। দেশ আপনার মতো বড় মনের নেতা চায়।"
"আর ফেরা যাবে না।"
"যাবে। সব ভুলে যান। আপনি ফিরুন।"
"নইলে ?"
"যেতে হবে। অনেকের যাওয়া রোধ করার জন্যে আপনার যাওয়া দরকার। ভাবুন দুর্যোধনবাবু। ভেবে বলুন। অপরাধীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে—আর বাড়াবেন না। দরকার নেতার। আপনার মতো। হৃদয়বান।"
উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন—"কথা দিলাম।"
উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র "আপনার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছি ।" চোখের ইঙ্গিত করতেই বেরিয়ে গেলেন সঞ্জয় ভঞ্জ—"উনি আর-ডি-এক্স বসানোয় এক্সপার্ট। স্কুটারে যা বসিয়েছিলেন কালরাতে, আজ সকালেই তা আমি ধরেছি—গ্যারেজের কড়ায় তার জড়াতে ভুলে গেছিলেন—সন্দেহ হয়েছিল প্রকাশবাবুর। আমি গিয়ে দেখেছিলাম আর-ডি-এক্স । সঞ্জয়বাবু, এসেছেন খোদার

উপর খোদকারি করার জন্যে।”

ধ্বসা চোখে চেয়ে রইলেন দুর্যোধন মাহাতো । ঘরে ঢুকলেন সঞ্জয় ভঞ্জ। হাত মুছলেন রুমালে । বললে ইন্দ্র—“স্কুটারের আর-ডি-এক্স বসিয়ে এসেছিলেন আপনার গাড়ির বনেটের তলায়—ইগনিশন চাবি ঘোরালেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন—প্রমাণের দরকার হত না। শঠে শাঠ্য সমাচরেৎ শাস্ত্রের বচন, দুর্যোধনবাবু আসুন—ও হ্যাঁ, নেমন্তন্নটা নিয়ে যান। শুভবিবাহ।

অচেতন বরাটকে ফাঁসি দেবে সন্ধ্যা আচার্য।

মনোহরের আশ্রিতা বোন— নো অবৈধ সম্পর্ক। অনেক খেলেছে, অনেক নাচিয়েছে—এখন ও ক্লান্ত। শুভরাত্রি ।”

তিন মহিলাই এবার হেসে উঠল তিনরকম সুরে। গাড়িতে ওঠার সময়ে ডি এফ ও বললেন প্রকাশকে “তোমার মত অনেস্ট আর ডেয়ারডেভিল অফিসার যদি আর জনাকয়েক পেতাম —”

“প্রমোশনটা অন্তত দিন,” বলে উঠল ইন্দ্রনাথ।

“কাঁচা মাংসখেকো আদিবাসীদের কাছে উনি। ছাড়া কেউ যেতে পারেন না—ডেথ-হাউসের ঠিকানা উনিই তো বের করলেন—ওই আদিম বাসিন্দাদের এলাকায়। হাওয়ার গতির খবর উনিই দিয়েছেন। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন মাংসপোড়ার তেলচর্বি হাওয়ায় ভেসে জঙ্গলের ওদিকে যেতে পারে না—শঙ্খচূড়ের শ্মশানে পৌঁছেছিল যেদিক থেকে—সেদিকে উনিই নিয়ে গেছিলেন। আমাদের।”

“রণ চৌধুরীকে দুর্যোধন মাহাতোর বাড়িতে নিয়ে গেলে না কেন ?"জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

“মাঝে মাঝে বড় বোকা হয়ে যাও, মৃগ। যাঁকে একবার মারতে গিয়েও মারতে পারেননি—বাড়ির মধ্যে তাঁকে দেখলে পিছনে লোক লাগাতেন দুর্যোধন—ডেথ-হাউস আবিষ্কার করা শিকেয় উঠত।

“সন্ধ্যাকে কে উদ্ধার করে আনল ?”

“প্রকাশ ঘটক। সঙ্গে আমি। সন্ধ্যাকে পাশের কোয়ার্টারে নিয়ে গেল আগে—আমি পাঠিয়ে দিলাম কবিতা আর চিত্রাকে—নাটকের বাকি অংশটা ওরা নিজেরাই রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছে।

মৃগ, মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে বেশি হয়—যদিও তুমি তা মানো না।”

“আমি শুধু জানি হাজার বছর আগেকার অস্ত্র এখনও মেয়েরা কাজে লাগাচ্ছে।”

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অতিথিরা। বললাম—“ভুরুর ধনুক আর চোখের তীর।”

-----সমাপ্ত-----